একটি ইচ্ছার অপমৃত্যু

যুথিকা বড়ুয়া

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন কি ভয়াবহ, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তখন আমাদের পরাধীন মাতৃভূমি বাংলাদেশের! গ্রামে-গঞ্জে শহরে চতুর্দিকে গনহত্যা, লুণ্ঠন, মা-বোনের সম্ভ্রমহানী, ধর্ষণ, যা আমাদের প্রত্যেকেরই কম বেশী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অবগত আছে! যখন প্রাণের দায়ে সাধারণ জনগণ নিজের মাতৃভূমি এবং পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে পলায়নের পথই বেছে নিয়েছিল। সেই সময় এক হতভাগ্য দরিদ্র কৃষক, ধরে নেওয়া যাক, তার নাম কেষ্টচরণ মন্ডল। তার পাঁচ বছরের অবোধ শিশুপুত্র মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়!

কেষ্টচরণ ছিলেন একজন সাধারণ মজদূর, খেটে খাওয়া মানুষ! দারিদ্র্যতা তাকে কখনো ঘায়েল করতে পারেনি! অসাধারণ আত্মবিশ্বাস, মনোবল আর সংকল্প নিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখতেন। বাপ-দাদার আমলের স্বল্পায়তনে ধানি জমিতে আনাচপাতীর চাষ করতেন। থাকতেন খড়-খুটোর ছাউনি দেওয়া ছোট্ট একটা মাটির ঘরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিংবা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবণতি ঘটলেও কেষ্টচরণকে কখনো বিভ্রান্ত করতে পারেনি!

কিন্তু কেষ্টচরণ তার একমাত্র পুত্রকে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে চিরতরে হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েন! যেদিন পৈত্রিক ভিটেবাড়ি সহ চাষের জমি পরিত্যাগ করতে তাকে এতটুকু দহন করেনি! পীড়া দেয়নি! বাস্তবের রূঢ়তা, সংকীর্ণতা, অমানবতা এবং হীনমন্যতার ক্ষোভে দুঃখে, শোকে স্ত্রী ও বারো বছরের কিশোরী কন্যার লাজ বাঁচাতেই অন্ধের মতো বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। পুত্রশোক বুকে চেপে ভয়ে আঁতঙ্কে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে গভীর বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাতারাতিই যশোর হয়ে এসে পৌঁছায় বেনাপোল সীমান্তে! সেখান থেকে দিনান্তবেলার শেষে দিগন্তের কোলে আঁধার ঢলে পড়লে তার পূনরায় যাত্রাভিযান শুরু হয়।

সীমান্তের কর্দমাক্ত এবং কন্টকময় দুর্গমপথ পেরিয়ে বনগাঁও হয়ে সরাসরি এসে আশ্রয় নেয়,পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের রিফিউজি ক্যাম্পে। কি নোংরা, দুর্গন্ধ গায়ের জামাকাপড়! পাদুকাময় রাস্তার ধূলোবালি! রুক্ষশুষ্ক এলোকেশ! অবিশ্রান্ত পদযাত্রায় অগণিত বিনিদ্র রজনী পোহায়ে ক্ষিদায় তৃষ্ণায় ভিখারীর মতো লাগছিল। মনে হচ্ছিল, মাটির তলদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে! অগত্যা, করণীয় কিছু নেই! সময়ের নিমর্মতা কাঁধে নিয়েই শুরু করেন তার নতুন জীবনধারা! বদলে যায়, প্রাত্যাহিক জীবনের

কর্মসূচী! অচেনা অজানা জায়গা। নিত্য নতুন অপরিচিত মানুষের মুখ। ভিন্ন মনোবৃত্তি। ভিন্ন বিশৃংঙ্খল পরিবেশ! যার পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া সম্ভবই ছিলনা। পদে পদে ভাগ্যবিড়ম্বনা। নিয়তি যাকে প্রতিনিয়তই পরিহাস করে, উপহাস করে, দুঃখ দীনতা কখনো যার পিছুই ছাড়ে না, সে মানুষ সুস্থ্যভাবে কখনো বেঁচে থাকতে পারেনা। একদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রিফিউজি ক্যাম্পেই মহাপ্রয়াণ ঘটে কেষ্টচরণের। আর দুঃখের দহনে করুণ রোদনে জীবনপাত করতে রেখে যান, স্ত্রী আর কন্যা সুধাকে। কত আর বয়সের ব্যবধান মা-মেয়ের! বোনের মতো লাগতো! আর সুধার তো একেবারেই কচি বয়স তখন। বাড়ন্ত শরীর। অপ্রাপ্ত বয়সেই যৌবন এসে আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছিল ওকে! যেন উপছে পড়তো! আর ঐ উপছে পড়া যৌবনই ছিল সুধার বিপদ অবশ্যম্ভাবী! প্রতিনিয়ত ক্ষুধার্ত হায়নার মতো লোভাতুর কামপ্রিয় পুরুষমানুষেরা ওকে ধাওয়া করতো পিছু পিছু! যখন ভোগের লালসায় নারী দেহের গন্ধে চুম্বকের মতো আকর্ষণে কলুষিত করে একজন পুরুষের মনবৃত্তিকে! অপবিত্র করে তার মনকে! অবমাননা করে নিজেকে! আর তারই অপকর্মে দূষীত হয় আমাদের সমাজ। যখন বাধ্যতামূলক অসহায় যুবতী মেয়েরা ছদ্মবেশী প্রতারকের প্রলোভনে বশ্যতার স্বীকার হয়ে পতিত হয়, নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত জীবনের এক ভয়ঙ্কর অন্ধগুহায়। যা আইনত অপরাধ এবং দন্ডনীয়! কিন্তু এসব গ্রাহ্য করছে কে! এ তো মনুষ্য চরিত্রের আবহমানকালের চিরাচরিত একটি প্রধান বৈশিষ্ঠও বলা যায়! বিশেষতঃ যাদের অন্তরে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধটুকুই নেই! রুচীবোধ নেই! যারা পাপ-পূন্যের ধার ধারেনা! মান-মর্যাদার তোয়াক্কা করেনা! যার অভাবে মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার পরিবর্তে বন্যপশুর মতো অমানবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই হরণ করে বসে!

সুধারানী অঁজপাড়া গাঁয়ের অত্যন্ত সহজ সরল নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। বয়সের তুলনায় বিবেক-বুদ্ধি একেবারে ছিল না বললেই চলে! মানুষজন দেখলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকতো। মুখ টিপে হাসতো! অথচ শরীরের গড়ন আর চমকপ্রদ যৌবন যেন একেবারে রসালো ফলের মতো টগবগ করতো! যার মুগ্ধ আর্কষণে ভ্রমরের মতো রস শোষণ করতে উড়ে এসে গেঁড়ে বসতে চেয়েছিল, রিফিউজি ক্যাম্পেরই স্বেচ্ছাসেবক নামধারী এক তরুণ যুবক। যেদিন বিপন্ন সময়ের শিকার হয়ে রাতারাতি রিফিউজি ক্যাম্প ছেড়ে শহরের অন্যত্রে গা ঢাকা দিয়ে সুধাকে রক্ষা করেছিলেন ওর মা।

কিন্তু তখন ওরা সভ্যসমাজে বসবাস করার উপযুক্ত ছিলনা। ভাষা জানতো না। ব্যবহার জানতো না। কাপড় পড়তে জানতো না। শুদ্ধ বাংলাও বলতে পারতো না। থাকতো গুদাম ঘরের মতো একটা স্যাঁতসেতে জায়গায়। যে বাড়িতে মা-মেয়ে দুজনেই ঝি-কাজ করতো। দু’বেলা এঁটো বাসন মাজতো। জামা-কাপড় কেঁচে দিতো। অবসরে

কাগজের ঠোঁঙ্গা বানাতো। তাতে ক'পয়সা আর উপার্জন হতো! ঘর ভাড়া দিয়ে দু'বেলা পেট ভরে অন্নও জুটতো না! কলসী নিয়ে পুকুরঘাটে জল ভরতে গেলে একহাত ঘোমটা দিয়ে বের হতো সুধা। আর সেটা পাড়ার বখাটে ছেলেদের জন্য ছিল, হাসির খোড়াক! ব্যঙ্গ করে বলতো, -'লজ্জাবতী ময়না, কথা কভু কয়না! মন যে কারো সয়না!' কিন্তু ওরা যে পরিহাস করতো, ওকে নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করতো, সেটাই মগজে ঢুকতো না সুধার! উল্টে মজা পেতো! হন্‌হন্‌ করে কিছুদূর গিয়ে ঘোমটার আড়ালে হি হি করে হাসতো। অথচ বাইরের পৃথিবীর রূপ-রং যখন ওর চোখে লাগলো, পৃথিবীকে যখন জানতে শিখলো, বুঝতে শিখলো, মানবাধিকারের দাবিতে মনুষ্যত্বের দাঁড়িপাল্লায় যখন জীবনের মূল্যায়ন করতে শিখলো, তখন একুশ বছরের পূর্ণ যুবতী সুধারানী! ক্রমান্বয়ে দুর্বিসহ জীবনের একটা সুরাহা খুঁজে পাবার আশায় নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বর্দ্ধিত করবার সাধনায় এক অভিনব ইচ্ছা-আকাঙ্খা ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে। কিন্তু কখন যে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে প্রস্ফূটিত ফুলের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠল, পাড়াপর্শীরা টেরই পেলনা কেউ! রূপে, গুণে একেবারে নিঁখুতভাবে পরিপূর্ণ!

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত বই "বাল্যশিক্ষা" সকাল সন্ধ্যে দু'বেলা মন্ত্রপাঠের মতো গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করে যেটুকু বিদ্যা অর্জন করেছিল, তাতে শুধু বেশভূষাই নয়, ভাষা, ব্যবহার, চালচলন, কথা বলার ঢং এমনভাবে রপ্ত করে নিয়েছিল, বেমালুম বদলে গেল সুধা! দেখতে পেয়েছিল ওর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুখময় ইঙ্গিতের একফালি ঝলক। প্রখর সংগ্রামী মনোভাবে জাগ্রত হয়, সমগ্র অস্থি-মজ্জা এবং হৃদয়ের কোণে ঘুমিয়ে থাকা চমকপ্রদ প্রতিভাও! বিস্ময়ে সবাই অভিভূত! যেন কোনো অজ্ঞাত এক কূলশীল ভদ্রমহিলা।

কিন্তু সামাজিক রীতি-নীতির কিছু বৈষম্যতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও সুধারানী বেরিয়ে এলো চার দেওয়ালের বদ্ধজীবন থেকে। ভুলে গেল ওর অতীতের ভাগ্যবিড়ম্বনায় দারিদ্র পীড়িত গ্রাম্য জীবনের দুঃখ দীনতার কথা! ভুলে গেল, মাতৃভূমি স্বাধীন বাংলাদেশকে! যার সম্মুখে ছিল এক সুদূর প্রসারী সম্ভবনার স্বপ্ন, কিংবা আশাতীত সফলতা! ধনধান্যে পুস্পেভরা যে দেশটি ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছিল, সুখ-সমৃদ্ধশালী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে! তা হোক, তবু স্বদেশে ফিরে যাবেনা সুধারানী। চেয়েছিল, নিজের কর্ম দক্ষতায় সাবলম্বী হতে, নিজস্ব মাটিতে শক্তপায়ে দাঁড়াতে! সভ্যসমাজে অবস্থানরত আর পাঁচ জনের মতো পূর্ণ মান-মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে! মায়ের দুঃখ চিরতরে মুছে দিতে! কিন্তু তা আর বাস্তবায়ীত হয়নি! সুধারানী পারেনি, ওর মনের বাসনাগুলিকে পূরণ করতে। মায়ের একান্ত ইচ্ছা এবং তার পীড়াপীড়িতে স্বদেশে ফিরে যেতেই ওকে ভীষণভাবে উদ্ধত করলো। ভেবেছিল, ফেলে আসা স্বল্পবিস্তর চাষের

জমিটুকু নিশ্চয়ই ফিরে পাবে। যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকেই শুরু হবে ওদের পূণর্জীবন। কিন্তু সদ্য সাজানো ঘর-সংসার ছেড়ে কোন্ কুক্ষণে যে ভাঙ্গা তড়ীতে পা দিতে গিয়েছিল, সূর্য্যিমামা তখনও অস্তাচলে ঢলে পড়েনি, স্বদেশের সবুজ বনভূমি আর ধানভাঙ্গার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েছিল খেলায়ই করেনি! রাতের অন্ধকারে সীমান্তের কাছাকাছি এসেই হঠাৎ বিনা নোটিশে কিছুক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল গাড়ি। সেই সময় সুধারানীও কয়েকজন পুরুষ যাত্রীর সঙ্গে নেমে পড়েছিল গাড়ি থেকে। যখন দুষ্টচক্রের শিকার হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মা-মেয়ে দুজনেই! যা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি সুধার মা। যেন তীরে এসে তড়ী ডোবার মতো অবস্থা।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই মায়ের নজরে পড়ে, সুধা গাড়িতে নেই। সীটের মধ্যে শুধু ওর হ্যান্ডব্যাগটাই পড়ে আছে। ব্যাগটা খুলে দ্যাখে, একখানা কাগজের টুকরো। তাতে লেখা ছিল, ‘ছোরির তালাশ করবি, খালাশ করে দেবো!’

ততক্ষণে সর্বণাশের কিছুই আর অবশিষ্ঠ নেই সুধারানীর! সব শেষ! অথচ বুকভরে কত আশা নিয়ে সানন্দে স্বদেশে ফিরে এসেছিল সুধারানীর মা। কিন্তু অদৃষ্টের কি লিখন! ভয়ে-আতঙ্কে রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর! জমে হীম গেল সারাশরীর। কি শান্তনা দেবে সে নিজেকে! কি কৈফেয়ৎ দেবে! সুধা তো আসতে চাইছিল না! ওর মরা বাপের দিব্যি দিয়ে, ওর ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে ওকে জবরদস্তী নিয়ে এসেছিল। সুধা যে নিজের মতো করে জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল! বাঁচতে চেয়েছিল! সুধার এ কি সর্বণাশ করল সে! আর কি কোনদিন ফিরে পাবে সুধাকে!

কিন্তু জলজ্যান্ত একটা যুবতী মেয়ে মন্ত্রের মতো রাতারাতি উধাও হয়ে গেল কোথায়? ওকে কারা নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কেন নিয়ে গেল? কিন্তু এ যে ধূর্ত এবং দুষ্ট লোকের একমাত্র চক্রান্ত, তা বুঝতে আর বাকী থাকেনা। আর কেইবা দেবে তার এই প্রশ্নের জবাব! সুধার মা যে দুর্বল, অসহায়, আশ্রয়হীন, সম্বলহীন, গন্তব্যহীন, অন্তবিহীন পথের যাত্রী। অবিরাম পদযাত্রায় যখন যেখানে থমকে দাঁড়ায়, সেটাই তার ক্ষণিকের আশ্রয়, ঠিকানা। যার কেউ নেই এই পৃথিবীতে!

পরবর্তীতে গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তর থেকে আনুমানিকভাবে জানা গিয়েছে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে সীমান্তের গুপ্তচরেরাই সুধারানীকে সঁপে দেয়, অত্যাচারী পাষন্ডদের হাতে। কেউ বলে, ‘আবর দেশের রাজা বাদশাদের হাতে।’

যেখানে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কেঁদে মরে গেলেও কেউ শুনবে না ওর আর্তনাদ! যার আজও পর্যন্ত আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি! সুধারানী জীবিত না মৃত, তা কেউ জানেনা!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী ।
২৫ শে মার্চ, ২০০৮,
guddi_2003@hotmail.com